# জল পড়ে পাতা নড়ে

## এইডা কি করলেন, ওস্তাদ!

### মুহম্মদ জুবায়ের

মার্চের বাইশে কবি আবিদ আজাদের মৃত্যুর এক বছরপূর্তি। নিচের রচনাটি লেখা হয়েছিলো কবির মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পরপরই। অসময়ে চলে যাওয়া আমাদের সতীর্থ বন্ধুটিকে মনে রেখে এই অপ্রকাশিত রচনা, সেই সময়ের অনুভূতিসহ, আজ নিবেদন করি।

১.

এইরকম কথা ছিলো না, ওস্তাদ। তবে কী কথা যে ছিলো, জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু বিপদ। দিনতারিখের লেখাজোখা নাই, মুখে বইলা-কইয়াও হয় নাই, এইসব না-লেখা না-বলা চুক্তির বিষয় – হাওয়ায় কথা চালাচালি। আপনে ঠিকই বুঝবেন।

এখন দেশে গেলে আপনের সাথে আরেকবার দেখা হইবো না, ঢাকা শহরের কোনোখানে আপনে আর নাই। 'শিল্পতরু'-র সাইনবোর্ড তখনো হয়তো ঝুইলা থাকবে, কিন্তু আমার আর সেইখানে যাওয়ার উপায় নাই। কার জন্যে আর যাই? আপনেই লিখছিলেন : 'যে শহরে আমি নেই, আমি থাকবো না ... আর তোমার মনে হবে, আমি নেই।'

মনে কিন্তু এখনই হইতেছে। আপনেরা যারা কবিতা-উবিতা লেখেন ওস্তাদ, অনেকদূরের না-জানা না-দেখা জিনিসও ক্যামনে জানি বুইঝা ফালাইতে পারেন! অবাক মানতে হয়। কিন্তু এতো জলদি কাট মারবেন তা একবারও কন নাই, আমরাও বুঝি নাই। বিদায় দেওয়া-নেওয়ার একটা দস্তুর আছে না?

আপনের সঙ্গে একখান বোঝাপড়ার মামলা ছিলো যে! একদিকে দেখলে তেমন কিছু না, আমার কাছে কিন্তু অনেকখানি। আপনেরে জিজ্ঞাসা করি তারও কায়দা নাই। করলেন কি, ওস্তাদ? এইডা কি কিছু হইলো, আপনেই কন!

২.

আবিদ আজাদের তিরোধানের খবরে কথাগুলো মনে আসে। এই ভাষায়ই তো কথা হতো। ঢাকায় অনেক কবি-লেখকদের মধ্যে পরস্পরকে ওস্তাদ সম্বোধন করার একটি প্রথা তখন চালু ছিলো, এখনো আছে কী না জানা নেই। আবিদ প্রায় সবাইকেই ওস্তাদ সম্বোধন করতে ভালোবাসতেন, শব্দটি তাঁর তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটের ডগায় লেগেই থাকতো।

ঢাকা থেকে ছোটো ভাইয়ের ইয়াহু ইনস্ট্যান্ট মেসেজ : 'আমাদের সময়ের একমাত্র পান খাওয়া কবি আবিদ আজাদ আর নেই'!

অসম্ভব! জবাবে এই শব্দটিই টাইপ করি, অনেকটা অজান্তে। জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছিলো?

আসলে অর্থহীন প্রশ্ন। কী হবে আর জেনে? 'নেই কেন সেই পাখি নেই কেন...?' নেই যে, সেটিই সবচেয়ে বড়ো সত্য। বিশ্বাস না হলে কিছু এসে যায় না, মানতে না চাইলেও তা পাল্টাবে না। আবিদ প্রশ্নাতীতভাবে আমার প্রজন্মের সবচেয়ে উজ্জ্বল কবি। তাঁর কবিতা কালের বিচারে টিকে যাবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে আমরা আরো অনেকদিন আবিদকে পড়বো, তা নিঃসন্দেহে জানি। কিন্তু আমার বন্ধু, কিছু দূরের হলেও বন্ধুই, আবিদ আর কোথাও নেই।

আবিদের সঙ্গে অনেক বছর যোগাযোগ ছিলো না। দোষ তাঁর নয়, দেশান্তরী আমি আজ ঊনিশ বছর হয়-হয়। কিছুকাল ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন, দুয়েকবার হাসপাতালও ঘুরে এসেছেন, সাম্প্রতিক কবিতায় সেসব খবর পাওয়া যাচ্ছিলো। তবু চলে যাওয়ার মতো গুরুতর অসুস্থ, তা জানা হয়নি। শুধু আমি কেন, তার ঘনিষ্ঠতমদের একজন মাহবুব হাসান, যিনি শেষদিন পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন, জানালেন আবিদের প্রস্থান আচমকা ও অপ্রত্যাশিত।

তবু শেষ কথা এই, আবিদ চলে গেলেন।

## ৩.

পরিচয় কীভাবে হয়েছিলো মনে পড়ে না। প্রয়োজনই বা কি? সময় ৭৪ বা ৭৫-এর কোনো একদিন। স্থান শরীফ মিয়া বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি-সংলগ্ন এলাকার বাইরে কোথাও হওয়া সম্ভবই নয়। ওই অঞ্চল তখন আমাদের দিনরাত্রির চারণক্ষেত্র – ওখানেই চরি-ফিরি, খাই-দাই গান গাই তাইরে নাইরে না, আড্ডা দিই, যে কোনো বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে তর্ক করি। মনে পড়ে, গুটিপোকারূপী সুমন সরকার তখন রূপান্তরিত হচ্ছেন প্রজাপতি আবিদ আজাদ হিসেবে। সেই হালকা-পলকা গড়নের মাঝারি উচ্চতার আবিদ প্রতিভা ও বা কবিত্বশক্তির বিচারে অনেক বড়ো উচ্চতাকেও অতিক্রম করেছিলেন অনায়াসে। গোঁফের তলায় তার মৃদু হাস্যময় মুখ ভোলা যাবে কোনোদিন? চোখেমুখে তখনো সদ্য কৈশোরের সরলতা ও মুগ্ধতা। আমি তাঁকে বলতাম কিশোরগঞ্জের কবি-কিশোর।

কবি আবিদ অসাধারণ অনুভূতিপ্রবণ, হৃদয়-নিংড়ানো আবেগের নির্যাস তাঁর একেকটি কবিতা। একদিন শরীফ মিয়ায় বসে বলেছিলেন, আমরাই পৃথিবীর শেষ রোম্যান্টিক, ওস্তাদ। এমন দিন আসবে যখন রোম্যান্টিকতার নামগন্ধও কোথাও থাকবে না।

তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয় শহীদ কাদরী ও মাহবুব হাসানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবিদের বাণিজ্য অভিযানের সময়। সত্তর দশকের শেষভাগে তিন কবির উদ্যোগে আজিমপুর এলাকায় 'ত্রিকাল' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা পায়। আড্ডার লোভে যাওয়া-আসা হতো। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘায়ু হয়নি, কবিদের বাণিজ্যঘটিত প্রতিভা বিষয়ে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করেই। আবিদ অবশ্য হাল ছাড়েননি। আগাপাশতলা কবি হয়েও মুদ্রণ ব্যবসায়ে সফলভাবে টিকে ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুবাদে কিছু স্বপ্নসম্ভবও ঘটে – সাহিত্য পত্রিকা 'কবি' ও 'শিল্পতরু' প্রকাশে এবং প্রকাশনা ব্যবসায় সাফল্যে।

‘ত্রিকাল’-এর কালেই আবিদের প্রথম কবিতার বই ‘ঘাসের ঘটনা’ প্রকাশ পায়। প্রুফ দেখার সময় ‘হানাবড়ির গান’ (‘আঘাত করো আঘাত করো দেখবে কিছু নেই...’) কবিতাটি আমার ভালো লেগে যায়। আবিদকে জানালে লাজুক কবির ফর্সা মুখ নিমেষে লালচে হয়ে ওঠে – কী যে কন, ওস্তাদ!

বই প্রকাশিত হলে আশ্চর্য হয়ে দেখি, ‘হানাবাড়ির গান’ কবিতাটি আমাকে উৎসর্গ করেছেন কবি। কোনো কবিবন্ধুর আমাকে কবিতা উৎসর্গ করার ঘটনা সেই প্রথম এবং শেষ। আবিদ আমাকে আবেগাপ্লুত ও কৃতার্থ করেছিলেন। অভিভূত হই ব্যাপারটি নিঃশব্দে ও আমার অজান্তে ঘটেছিলো বলে। অথচ এই নিয়েই তাঁর সঙ্গে একটি বোঝাপড়া আমার বাকি রয়ে গেলো। ‘ঘাসের ঘটনা’-র পরবর্তী এক সংস্করণে দেখি ‘হানাবাড়ির গান’ কবিতার উৎসর্গটি উধাও। কোনো অভিমান বা অনুযোগ নয়, আবিদকে শুধু জিজ্ঞেস করার ছিলো, উৎসর্গ কি ফিরিয়ে নেওয়ার জিনিস, ওস্তাদ?

এই প্রশ্নটি এখন আর করি কাকে? আবিদ যে আমাকে সুযোগ দিলেন না, এটিই বরং অনুযোগ হয়ে থেকে যাক। অনন্তকাল ধরে। ঠিক যেভাবে কিশোরগঞ্জের কিশোর কবির সলজ্জ হাসিমুখ আমার ভিতরে খোদাই হয়ে আছে।

## ৪.

বন্ধুবিয়োগের সংবাদ কবে আর কার কাছে প্রত্যাশিত ছিলো? মৃত্যু অমোঘ ও অনিবার্য জেনেও বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়। এইসব মৃত্যু আমার আত্মার একেকটি খণ্ডাংশ ছিঁড়ে নিয়ে যায়। এক মনুষ্য হৃদয় আর কতোটা নিতে পারে?

বস্তুত সব মৃত্যুই শেষ বিচারে অনাকাঙ্খিত ও শোকময়। তবু প্রায় সমবয়সী বন্ধুর প্রয়াণ আমাদের শেকড় ধরে টান দেয়। এমন বয়সে উপনীত হয়েছি যে আমাদের পূর্বের প্রজন্মের কারো মৃত্যু, তা যতো শোকাবহ হোক, অনেকটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। অথচ আবিদের বিদায় মানে তো আমার কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখার সময় হয়ে যাওয়া – বাকি আর কয় ঘড়ি?

*মার্চ ২০০৬*

**email : mz1971@gmail.com**